৩য়
পর্ব
দ্বীন কায়েম
একটি কৌশলগত পর্যালোচনা
الحكمة
আল হিকমাহ
মিডিয়া
আবু আনওয়ার আল হিন্দি
(হাফিজাহুল্লাহ)

দ্বীন কায়েম

একটি কৌশলগত পর্যালোচনা

৩য় পর্ব

আবু আনওয়ার আল হিন্দি (হাফিজাহুল্লাহ)

পরিবেশনায়

আল হিকমাহ মিডিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"মুসলিমরা যখন পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিল, উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হরমুযানের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, কারণ হরমুযান ছিল পারস্যের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। পারস্যবাসীদের আক্রমণ করার সর্বোত্তম কৌশল কি হবে- উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তা হরমুযানের কাছে জানতে চাইলেন। হরমুযান জবাবে বললোঃ 'আজকে পারস্য সাম্রাজ্যের তুলনা হল, দুটি ডানা, শরীর এবং একটি মাথার সমন্বয়ে গঠিত একটি পাখির ন্যায়।' উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করলেন, 'মাথা কোনটা?' হরমুযান বললোঃ 'নাহওয়ান্দ'। যে দুটি শক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের দুই ডানা স্বরূপ হরমুযান সেগুলো সম্পর্কেও উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জানালেন। তারপর হরমুযান বললোঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন, পারস্য সাম্রাজ্যকে কিভাবে পরাজিত করতে হবে, এই প্রশ্নের জবাব হল, ডানা দুটোকে আগে কেটে ফেলুন, তারপর মাথাটাকে সরানো সহজ হয়ে যাবে।' উমার রাদ্বিয়াল্লহু আনহু সাথে সাথে বললেনঃ 'হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যা বলছো। নিশ্চয় আগে মাথা কেটে ফেলতে হবে, তাহলে ডানা দুটোকে সরানো সহজ হবে।'

এ ব্যাপারে আমি নিজে একটি উদাহরণ তৈরি করেছি। সম্ভবত এর আগেও আমি এ বিষয়ে কথা বলেছি। বর্তমানে আমাদের শত্রুদের তুলনা হল একটি বিষাক্ত গাছের ন্যায়। ধরা যাক, এই গাছের কান্ডের পুরুত্ব হল ৫০ সেমি.। গাছটির বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও পুরুত্বের অনেক ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা আছে। গাছটির কান্ড হল অ্যামেরিকা। আর ন্যাটোর সদস্য অন্যান্য দেশগুলো, আরব শাসকগোষ্ঠী, ইত্যাদি হল গাছটির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। আর আমাদের (মুজাহিদিন) তুলনা হল, সে ব্যক্তির মতো যে এই গাছ কেটে ফেলতে চায়। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং উপকরণ সীমিত। তাই আমরা দ্রুত এ কাজটি (গাছ কেটে ফেলা) করতে সক্ষম নই। আমদের একমাত্র উপায় হল, ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটি করাতের মাধ্যমে এই গাছের কান্ডটিকে কেটে ফেলা। আমাদের লক্ষ্য হল, এই গাছের কান্ড কেটে ফেলা এবং গাছটি ভূপাতিত হবার আগে না থামা।

ধরুন, আমরা গাছের কান্ডের ৩০ সেমির মতো কেটে ফেলেছি। এখন, আমরা একটা সুযোগ পেলাম গাছের কোন একটি ডাল, যেমন ব্রিটেন; সম্পূর্ণ ভাবে কেটে ফেলার। এক্ষেত্রে আমাদের উচিৎ হবে এই সুযোগ উপেক্ষা করে, কান্ড সম্পূর্ণভাবে কাটার কাজে মনোনিবেশ করা।

যদি আমরা এই ডাল, কিংবা সেই ডাল কাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরি, তাহলে আমরা কখনোই আমাদের মূল কাজ (কান্ড কেটে কুফরের গাছকে ভূপাতিত করা) সম্পন্ন করতে পারবো না।

এভাবে আমাদের কাজের গতিও বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং আরো গুরুতর ব্যাপার হল, আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

গাছ ভূপাতিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কান্ড কাটার কাজ চালিয়ে যাবো। ইন শা আল্লাহ্, গাছ ভূপাতিত হবার পর, শাখাগুলো আপনাআপনিই মারা যাবে।

আপনারা দেখেছেন আফগানিস্তানে রাশিয়ার কি অবস্থা হয়েছে। যখন মুজাহিদিন কমিউনিজমের কান্ড, রাশিয়াকে কাটার দিকে মনোনিবেশ করলেন, কমিউনিজমের গাছ ভুপাতিত হয়ে গেলো। আর তারপর দক্ষিণ ইয়েমেন থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত সকল ডাল-পালা [বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র] মরে গেল। অথচ এই ডালপালাগুলো কাটার ব্যাপারে মুজাহিদিনের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না।

সুতরাং আমাদের অবশ্যই সকল তীর, সকল ল্যান্ডমাইন, সকল অস্ত্র অ্যামেরিকার প্রতি তাক করতে হবে। শুধুমাত্র অ্যামেরিকার প্রতি, আর কারো প্রতি না, হোক সেটা ন্যাটো বা অন্য কোন দেশ।”

- আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস থেকে গৃহীত গত পর্বে উসামার মানহাজের ব্যাপারে যে পর্যালোচনা এসেছে তার সারসংক্ষেপ ফুটে উঠেছে শায়খের নিজের এই কথায়। আমি আমার ভাইদের বিশেষভাবে অনুরোধ করবো, অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস গুলো গভীর মনোযোগের সাথে পড়ার জন্য। ভালো হয় যদি কোন ভাই, নির্বাচিত কিছু অংশ অনুবাদের কাজে হাত দেন। যদি ভাইরা চান এবং সময় হয় তাহলে- আমি এই থ্রেডে অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টসের কিছু নির্বাচিত অংশ নিয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করতে পারি বিইযনিল্লাহ। মানহাজ, মাসলাক, মাসআলাগত পার্থক্য, আক্বীদাগত পার্থক্য, স্ট্র্যাটেজি এরকম বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের ভাইদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং প্রান্তিকতা দেখা যায়। এটা সালাফী এবং হানাফি-দেওবন্দি, দুই পক্ষের ভাইদের মধ্যেই দেখা যায়। আলহামদুলিল্লাহ, সক্রিয়ভাবে মানহাজের কাজের সাথে যারা জড়িত, বিশেষ করে তরুণ ভাইদের মধ্যে- এ ব্যাপারটা কম। কিন্ত যারা নিজেদের মানহাজের সমর্থক দাবি করেন, কিন্তু সক্রিয় ভাবে কাজের সাথে জড়িত নন, তাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে এই ভ্রান্তিগুলো বিদ্যমান। ইন শা আল্লাহ্, আমাদের ভাইদের জন্য অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস গুলোর অধ্যয়ন এক্ষেত্রে অত্যন্ত ফায়দামান হতে পারে। উল্লেখ্য যে শায়খ নাসির বিন আলি আল-আনসি রাহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান হাফিযাহুল্লাহ দুজনেই অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টসগুলো যে সত্য এবং জেনুইন এ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং মুজাহিদিন এবং মানহাজের সাথে জড়িত ভাইদের এই ডকুমেন্টসগুলো অধ্যায়ন এবং

এগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণের কথা বলেছেন। সাথে তারা এও বলেছেন- যদিও এ ডকুমেন্টগুলো সঠিক, তবে অ্যামেরিকা এগুলো আংশিকভাবে প্রকাশ করেছে এবং সবগুলো প্রকাশ করেনি।

বৈশ্বিক জিহাদের দুটি অক্ষ আছে। একটি হল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জিহাদ, যা হল বহিঃশত্রুর মোকাবেলায়। আরেকটি হল আঞ্চলিক পর্যায়ে জিহাদ, যা হল আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে। গত দুই পর্বে, আমরা মূলত প্রথম অংশটি নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে আমরা আলোচনা করবো, আভ্যন্তরীন শত্রুর মোকাবেলায় উসামা তথা তানজীম আল-ক্বাইদাতুল জিহাদের মানহাজ কি – তা নিয়ে। এ আলোচনার জন্য, গত দশকে আল-ক্বাইদার আঞ্চলিক শাখাগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা চালাবো। আশা করা যায়, এই আলোচনা থেকে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে জিহাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, কোন ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ, এবং কোন কৌশলগুলো অনুসরণ করা উচিৎ, সে বিষয়ে আমরা কিছুটা ধারণা পাবো। এখানে আমরা, বিশেষ করে তিনটি আঞ্চলিক জিহাদের অঙ্গন – ইরাক, ইয়েমেন এবং শাম নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা AQI [Al Qaidah in Iraq], AQAP [Al Qaeda in the Arabian Peninsula], Jabhat al Nusra [Tandhim al-Qaidah fi BIlad ash-Sham] এবং ISIS/IS [জামাতুল বাগদাদী] এই দলগুলোর কার্যক্রম ও কৌশলের দিকে নজর দেবো। আমরা এখানে AQIM [Al Qaidah in the Islamic Maghrib] নিয়ে আলোচনায় যাবো না, কারণ AQAP এবং AQIM এর গৃহীত কৌশল এবং পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান, যেকারণে AQAP নিয়ে আলোচনা করাটাই যথেষ্ট হবে।

কেন আমরা এই দলগুলো, তাদের কার্যক্রম, এবং সাফল্য-ব্যার্থতা নিয়ে আলোচনা করছি? আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যে ভুল ইতিমধ্যে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি না করা। কারণ মু'মিন এক গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না। যুদ্ধে লোকবল, অস্ত্রের সংখ্যা ও শক্তি, আর্থিক শক্তির চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কৌশল। এবং বারবার একই ভুলের পুনরাবৃত্তির সুযোগ যুদ্ধ আপনাকে দেবে না। যুদ্ধ এক নির্মম ও কঠোর শিক্ষক। কিন্তু যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্য এই শিক্ষা ফলপ্রসু। একই সাথে এটাও পরিষ্কার করা দরকার যে কোন মুজাহিদিন জামা'আ এবং মুজাহিদিন উমারাহ এর সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ।

AQI:

AQI হল আল-ক্বায়িদার প্রথম আঞ্চলিক শাখা, যা গঠিত হয় ২০০৩ সালে। এর আমীর ছিলেন শায়খ আবু মুসাব আল যারক্বাউয়ী রাহিমাহুল্লাহ। শায়খ যারক্বাউয়ী তাওহীদ ওয়াল জিহাদ নামের একটি তানজীমের আমীর ছিলেন, যে তানজীমের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন আল মুওয়াহিদ, শায়খ

আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাক্বদিসি হাফিযাহুল্লাহ। পরবর্তীতে শায়খ মাক্বদিসি, ‘ইলমের ক্ষেত্রে গভীরতর মনোনিবেশের জন্য আমীর পদ শায়খ যারক্বাউয়ীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার উপর অর্পণ করেন। ইরাক যুদ্ধের প্রথম বছর তাওহীদ ওয়াল জিহাদ স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করলেও, ২০০৪ এর অক্টোবরে শায়খ যারক্বাউয়ী আনুষ্ঠানিক ভাবে শায়খ উসামা তথা আল-ক্বাইদার কাছে বাই'য়াহবদ্ধ হন। তবে আল-ক্বাইদা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে বাই'য়াহবদ্ধ না এমন দল এসময়ে ইরাকে জিহাদরত অবস্থায় ছিল [আনসার আল ইসলাম]। শায়খ যারক্বাউয়ীর বাই'য়াহর পর, খুরাসান থেকে বেশ কিছু আল-ক্বাইদা সদস্যকে ইরাকে পাঠানো হয়, শায়খ যারক্বাউয়ীকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করার জন্য। যার মধ্যে শায়খ আবু হামযা আল মুহাজির রাহিমাহুল্লাহ, এবং শায়খ আবু সুলাইমান আল উতায়বী অন্যতম। পরবর্তীতে শায়খ উসামার পরামর্শে AQI কে বিলুপ্ত ঘোষণা করে মুজাহেদীন শূরা কাউন্সিল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এটি দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাকে রূপ নেয়।

শায়খ যারক্বাউয়ীর মৃত্যুর পর, দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাক নামক ইমারাহর ঘোষণা দেয়া হয়, শায়খ উসামার সাথে আলোচনা না করে এবং তার সম্মতি ছাড়াই। শায়খ উসামা এই ঘোষণার কথা জানতে পারেন মিডিয়ার মাধ্যমে। তিনি তখন এক চিঠিতে জানান, যদি ইমারাহ ঘোষণার আগে তার কাছে অনুমতি চাওয়া হতো, তবে তিনি কক্ষনোই তাতে সম্মতি দিতেন না, কারণ ময়দানের বাস্তব পরিস্থিতি ইমারাহ ঘোষণার উপযুক্ত ছিল না। তবে যেহেতু একবার ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে তাই কোন রকম বিভেদ যেন সৃষ্টি না হয় এবং মুজাহিদিনের ভাবমূর্তি যেন না নষ্ট হয়, সেকারণে তিনি রাষ্ট্র ঘোষণার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। সত্যবাদী শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরি এই কথার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ইমারাহ গঠন এবং তাতে শায়খ উসামার আপত্তি সংক্রান্ত এই পয়েন্টটি গুরত্বপূর্ণ এবং আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

আল-ক্বাইদা ইরাককে বিলুপ্ত করে মুজাহিদিন শূরা কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ইরাকের জিহাদকে আল-ক্বাইদার জিহাদ হিসেবে চিত্রিত করার পরিবর্তে, ইরাকী জনগণ এবং উম্মাহর জিহাদ হিসেবে চিত্রিত করা। একারণেই যখন দাওলাতুল ইসলামিয়্যা ফিল ইরাক গঠিত হয়, তখন শায়খ উসামার কাছে শায়খ আবু উমার আল বাগদাদি বাই'য়াহ প্রদান করলেও, মিডিয়াতে এই বাই'য়াহর কথা প্রকাশ করা হয় নি। শায়খ আইমান, শায়খ আল-মাকদিসি, এবং শায়খ আবু ক্বাতাদা সহ আরো অনেকে এই বাই'য়াহর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। জামাতুল বাগদাদির পক্ষ থেকে অনেক সময় বলা হয় আবু উমার আল বাগদাদী এবং আবু বাকর আল বাগদাদীর কখনো শায়খ উসামা এবং পরবর্তীতে শায়খ আইমানের কাছে বাই'য়াহ ছিল না। কিন্তু এটা নির্জলা

মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই না। মিথ্যাবাদি আদনানীও এক সময় এ সত্য স্বীকার করেছে, যদিও সে এই বাই'য়াহর হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছে।

আল ক্বাইদা ইরাকের কিছু যুদ্ধ কৌশলের সমালোচনা শায়খ উসামা শুরু থেকেই করে আসছিলেন। যার মধ্যে তিনটি মূল সমালোচনা ছিলঃ ১) শিরচ্ছেদের ভিডিও প্রকাশ, ২) শি'আদের উপাসনালয়, মার্কেট ইত্যাদি জায়গায় নির্বিচারে হামলা এবং ৩) সাধারণ মুসলিম, যাদের মধ্যে অনেক বিদ'আ, গোমরাহি এবং অজ্ঞতা আছে, তাদের প্রতি অতি কঠোরতার কারণে জিহাদকে সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এই ব্যাপারে শায়খ উসামার নির্দেশে শায়খ আইমান, বেশ কয়েকবার শায়খ যারক্বাউয়ীকে চিঠি লেখেন। শায়খ উসামার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল অ্যামেরিকাকে আক্রমণের মূল ফোকাস বানানো। কিন্তু শায়খ যারক্বাউয়ী সিদ্ধান্ত নেন, শি'আদের আক্রমণের মাধ্যমে জিহাদকে একটি শি'আ বিরোধী রূপ দেয়া। এর ফলে শি'আরা যখন আক্রমণ চালাবে, সুন্নিরা বাধ্য হয়েই শায়খ যারক্বাউয়ীকে সমর্থন দেবে। কিছু সময়ের জন্য এই পদ্ধতি সাফল্য পায়। কিন্তু দাওলাতুল ইরাক গঠনের পর, আনবারের গোত্রগুলোর সাথে দাওলাহ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, জিহাদ জনসমর্থন হারিয়ে ফেলে, এবং অ্যামেরিকা এটা সুচারু ভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে।

মূলত আল ক্বাইদা ইরাক এবং পরবর্তীতে দাউলাতুল ইরাকের নীতি ছিল অনেকটা "একলা চলো রে" ধরণের। তারা সর্বদা অধিক শোরগোল হয় - আক্ষরিক এবং মিডিয়াগত ভাবে – এমন অপারেশান এবং ঘোষণার দিকে অনুরক্ত ছিল, এবং তাৎক্ষণিক বিজয়কে দীর্ঘমেয়াদী বিজয়ের উপরে প্রাধান্য দিতো। এছাড়া এক্সক্লুসিভলি সামরিক টার্গেটে হামলার পরিবর্তে বেসামরিক "সফট টার্গেটে" হামলা করার প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি ছিল। আর তারা ঢালাওভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিল যা তাঁদেরকে সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পরবর্তীতে জামাতুল বাগদাদী এই সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে এবং এগুলোর তীব্রতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আর যে তিনটি সমালোচনা শায়খ উসামা করেছিলেন, সেগুলো ব্যাপকভাবে তারা গ্রহণ করেছে। একারণে আল-আদনানী যদিও একজন মিথ্যাবাদী, কিন্তু যখন সে বলেছিল " এ আমাদের মানহাজ নয়" তখন সে সত্যই বলেছিল। ওয়াল্লাহি – নিশ্চয় উসামার মানহাজ আর আল বাগদাদীর মানহাজ এক না। নিশ্চয় তানজীম আল-ক্বাইদাতুল জিহাদ আর জামাতুল বাগদাদীর মানহাজ এক না। উসামা এবং তানজীম আল-ক্বাইদাতুল জিহাদের উদ্দেশ্য সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে জিহাদের জন্য সমর্থন সৃষ্টি করা এবং উম্মাহকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করা। আর জামাতুল বাগদাদীর উদ্দেশ্য হল, উম্মাহকে তাকফির করা এবং জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। হয় আমাদের সাথে, অথবা আমদের বিরুদ্ধে – বুশের এই মানহাজই হল আল-বাগদাদীর জামা'আর মানহাজ।

AQAP:

আনুষ্ঠানিক ভাবে AQAP গঠিত হয় ২০০৯ সালে, আল-ক্বাইদা ইন ইয়েমেন এবং আল-ক্বাইদা ইন বিলাদুল হারামাইন এর একীভূতীকরনের মাধ্যমে। শায়খ ইউসুফ আল উয়াইরী রাহিমাহুল্লাহ নেতৃত্বে ২০০১ এর পর বিলাদুল হারামাইন এবং ইয়েমেনে আল-ক্বাইদার কিছু সক্রিয় সেল গড়ে ওঠে, পরবর্তীতে এগুলোই একীভূত হয়ে AQAP গঠন করে। AQAP এর প্রথম আমীর ছিলেন শায়খ আবু বাসীর নাসির আল-উহায়শী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি তানজীম আল-ক্বাইদার নায়েবে আমীরও ছিলেন। বর্তমানে AQAP এর আমীর হলেন শায়খ আবু হুরায়রা ক্বাসিম আর-রাইমি হাফিযাহুল্লাহ। বিশিষ্ট শায়খ এবং আমাদের সবার প্রিয়, ইমাম আনওয়ার আল-আওলাক্বি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন AQAP এর সদস্য। তবে তিনি এর আমীর ছিলেন না। শায়খ নাসির আল উহায়শী, শায়খ উসামার কাছে একটি চিঠি লিখে শায়খ আওলাকীকে AQAP এর আমীর বানানোর প্রস্তাব দেন, কিন্তু শায়খ উসামা বলেন, শায়খ আওলাকীর ব্যাপারে অনেক প্রশংসা এবং উত্তম কথা তার কানে এসেছে, যদি আল্লাহ্ সুযোগ দেন তিনি শায়খ আওলাকীর সাথে মুখোমুখি কথা বলতে আগ্রহী, কিন্তু আমীর বানানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তিনি শায়খ আওলাকী-কে আরো পর্যবেক্ষন করার পক্ষপাতী [সূত্র অ্যাবোটাবাদ ডকুমেন্টস]।

এখান থেকে তানজীম আল-ক্বাইদার নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি রকম শক্ত এবং অনমনীয় নিয়ম গৃহীত হয়, তার একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। শায়খ আওলাকীর ব্যাপারে শায়খ উসামার কোন বিশেষ সন্দেহ ছিল না। না তার যোগ্যতা সম্পর্কে উমারাহদের মধ্যে সন্দেহ ছিল। কিন্তু যেহেতু শায়খ আওলাকী ছিলেন ময়দানের জিহাদে তুলনামূলকভাবে নতুন, তাই শায়খ উসামা, শায়খ আওলাকীকে তখনি আমীর না বানিয়ে, শায়খ নাসির আল উহায়শীকে আমীর পদে থাকার নির্দেশ দেন। এখান থেকে আমাদের ভাইদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপার আছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত যোগ্যতাই যদি একমাত্র মাপকাঠি হতো তাহলে শায়খ আওলাকিকে আমীর না বানানোর কোন কারণ আপাতদৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট না। প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা, অধ্যাবসায়, আনুগত্য মেনে কাজ করার উপযোগী মানসিকতা, তাযকিয়্যাহ এবং কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করা। আমাদের দেশে যোগ্য ভাইদের অভাব নেই আলহামদুলিলাহ- কিন্তু দুঃখজনক ভাবে আমরা দেখি, আনুগত্য মেনে কাজ করার লোকের অভাব। আমাদের এ ব্যাপারটা ভালো ভাবে মাথায় ঢুকিয়ে নেয়া উচিৎ যে, আমাদের যার যে যোগ্যতাই থাকুক না কেন, আমরা সবাই হলাম আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর নগন্য সৈন্যমাত্র। আমাদের চারপাশের বলয়ের প্রেক্ষিতে হয়তো আমাদের নিজেদের অনেক যোগ্য মনে করছি, কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখা উচিৎ,

এই তানজীম পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জিহাদ চালিয়ে আসা, বিভিন্ন তানজীমের সব চাইতে মেধাবী, অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ উমারাহ এবং উলামার দ্বারা, যারা চার-পাঁচ দশক ধরে ময়দানে জিহাদ করে আসছেন। অতএব, চারপাশের মানুষের মাপকাঠিতে নিজের যোগ্যতা না মেপে আমাদের উচিৎ এই মানুষগুলোর তুলনায়, আমার বা আপনার সামরিক কিংবা কৌশলগত মতামত বা পরিকল্পনার ওজন কতটুকু, তা মাপা। একইসাথে আমাদের এটাও স্মরণ করা উচিৎ, আমাদের অনেক আপাতদৃষ্টিতে যোগ্য ভাইদের কথা AQAP এর ম্যাগাজিন ইন্সপায়ারে আসেনি। আমাদের অনেক আপাতদৃষ্টিতে বিচক্ষণ ভাইদের কথা আল-নুসরার ভাইদের মধ্যে আলোচিত হয় নি। বরং ইন্সপায়ারে কথা বলা হয় আমাদের সেসব নাম না জানা ভাইদের কথা, যারা শুনেছেন এবং মেনেছেন, এবং আল্লাহ্ তাদের মাধ্যমে আল্লাহর শত্রু এবং আমাদের শত্রু অভিজিৎ, নিলয়, ওয়াশিকুরদের হত্যা করেছেন। AQAP এর সম্মানিত শায়খ, আমাদের অনলাইনে লেখালেখির কারনে তুমুল জনপ্রিয় কোন ভাইয়ের মতো হবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন নি, বরং তিনি ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন, আফসোস করেছেন, ফয়সাল বিন নাইম দ্বীপ, জিকরুল্লাহ আর আরিফুলের মতো হবার জন্য। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার এবং অনুধাবন করার তাউফীক্ব দান করুন।

ফিরে যাই AQAP-র কথায়। আল-ক্বাইদা ইন ইরাকের ভুল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ইয়েমেনে প্রয়োগ করা হয়। ২০১১ সালের গৃহযুদ্ধের সময় আল-ক্বাইদা ইন ইয়েমেন আদেন প্রদেশের বিশাল অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়, এবং সেখানে শারীয়াহর শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তবে এই কাজগুলো আল-ক্বাইদার ব্যানারের পরিবর্তে আনসার আশ-শারীয়াহর ব্যানারে করা হয়। যখন দেখা গেল মুরতাদ ও কাফিররা ব্যাপকভাবে আদেনে হামলা চালাতে যাচ্ছে, যার ফলে সাধারণ মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হবে, তখন আনসার আল-শারীয়াহ আদেনের নিয়ন্ত্রন ছেড়ে দেয়। এছাড়া ২০১৫তে আল-ক্বাইদা মুকাল্লা দখল করে নেয়। মুকাল্লার মূল ব্যাংক থেকে ট্রাকে করে টাকা উঠিয়ে নিয়ে আল-ক্বাইদা মুসলিম জনগণের মধ্যে বিতরণ করে। যখন ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়, তখন সরকারি বিশাল বিশাল অফিস এবং গভর্নরদের রাজকীয় বাসভবনগুলোকে আল-ক্বাইদা সাধারণ মুসলিম জনগণের আশ্রয়ের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। মুকাল্লাতেও আল-ক্বাইদা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর, সরাসরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে না রেখে, শাসনভার Sons of Hadhramaut/হাদরামাউতের সন্তানেরা নামে একটি কোয়ালিশনের কাছে অর্পণ করে। ২০১১ সালে এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালে বেশ কয়েকবার ইয়েমেনে ইমারাহ ঘোষণার গুজব শোনা গেলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে কখনোই এরকম কিছু বলা হয় নি। বরং আল –ক্বাইদা ইয়েমেনের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে তারা একটি গেরিলা দল, মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত একটি দল, অন্য

মুসলিমদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং তারা তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলে সাধ্যমতো শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়।

এসব কৌশলের ফলে আল-ক্বাইদা ইয়েমেনে, বিশেষ করে দক্ষিণ ইয়েমেনে ব্যাপক জনসমর্থন উপভোগ করে। আনসার আশ-শারীয়াহর বিরুদ্ধে আমেরিকার হামলাকে সাধারণ জনগণ নিজেদের উপর হামলা বলেই গণ্য করে। একই সাথে এটাও লক্ষণীয়, আর সব আল-ক্বাইদা শাখার মধ্যে ইয়েমেনের শাখাটিই আমেরিকার উপর হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। এ থেকে এ সত্যেরই প্রমাণ মেলে, সাধারণ মুসলিম জনগণের সমর্থনপুষ্ট একটি স্থিতিশীল ঘাঁটি পশ্চিমা দেশগুলোতে, বিশেষ করে আমেরিকাতে হামলা চালানোর জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। ইয়েমেনের এই শাখার ব্যাপারে আরেকটি গুরত্বপূর্ণ তথ্য হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিসে বর্ণিত আদান-আবইয়ানের ১২,০০০ সৈন্যের বাহিনী তৈরির কাজ এই দল করে যাচ্ছে।

জাবহাত আল-নুসরাঃ

আল-ক্বাইদা ইন ইরাকের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সে ব্যাপারে আঞ্চলিক শাখাগুলোকে সতর্ক করার ব্যাপারে বারবার শায়খ উসামা তৎকালীন নায়েবে আমীর শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিব্বির কাছে চিঠি পাঠান। তিনি বারবার আঞ্চলিক শাখাগুলোর জন্য একটি লিখিত দিকনির্দেশনা বা গাইডলাইন তৈরির তাগাদা দেন। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় হাকীম আল উম্মাহ আশ-শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরি লিখিত 'জিহাদের সাধারণ নির্দেশনাবলী'। এই ফোরামের ভাইরা নিশ্চিত ভাবেই এই লেখার সাথে পরিচিত। যাদের এখনো পড়ার সুযোগ হয় নি তারা অবশ্যই এটা পড়ে নেবেন, এবং আত্মস্থ করবেন।

এই লেখাতে হামলার টার্গেট নির্ধারণ এবং দাওয়াহর ব্যাপারে কিছু মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে যার অনুসরণ স্থানীয় পরিসর এবং আন্তর্জাতিক পরিসর, উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এ দিক নির্দেশনায়, আন্তর্জাতিক ভাবে হামলা, অর্থাৎ অ্যামেরিকান টার্গেটে হামলা, কিংবা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অন্য কোন পশ্চিমা টার্গেটে হামলা আর স্থানীয় জিহাদের ক্ষেত্রে হামলার জন্য লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের জন্য কিছু মুল্যবান এবং মৌলিক পার্থক্য করা হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে হারবি কুফফার, বিশেষ করে অ্যামেরিকার, সামরিক-বেসামরিক যেকোন টার্গেটে হামলা করা উৎসাহিত করা হয়েছে। হতে পারে সেটা বোস্টন হামলার মতো "সফট টার্গেটে", কিংবা ফোর্ট হুডে নিদাল হাসানের হামলার মত সামরিক টার্গেটে। ইন্সপায়ার ম্যাগাজিনের মাধ্যমেও এ বার্তা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে অবস্থিত কুফফারদের বিরুদ্ধে হামলার ক্ষেত্রে কিংবা

তাগুতের সেনাদের বিরুদ্ধে হামলার ক্ষেত্রে সফট টার্গেট এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে যাতে করে এতে মুসলিমদের কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়। এ কারণে প্যারিসে জামাতুল বাগদাদীর হামলার কৌশল বিরোধিতা আমরা করি না, বরং প্রশংসা করি। কিন্তু জাকার্তা কিংবা ইস্তানবুলে বোমা হামলার কৌশলগত সমর্থন আমরা করি না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করতে পারেন, অভিজিৎ জনসম্মুখে কুপিয়ে মারা আমরা সমর্থন করি, কিন্তু যদি অভিজিৎকে মারার জন্য বইমেলাতে বোমা হামলা হতো তবে কৌশলগত দিক থেকে তা সমর্থনযোগ্য না, কারণ এতে করে সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এ গাইডলাইনের সবচেয়ে সুচারু বাস্তবায়ন আমরা দেখি তানজীম আল-ক্বাইদা ফিল বিলাদ আশ-শাম বা জাবহাত আল-নুসরার কাজের মধ্যে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে জাবহাত আল নুসরার কার্যক্রমের শুরু ২০১২ সালে। সিরিয়াতে বাশার বিরোধী জিহাদ শুরুর পর, শায়খ আইমান আল যাওয়াহিরির নির্দেশে আবু বাকর আল-বাগদাদি, শায়খ আল ফাতিহ আবু মুহাম্মাদ আল জাওলানী সহ কয়েকজনকে সিরিয়াতে পাঠান সিরিয়াতে আল-ক্বাইদার একটি শাখা গড়ে তোলার জন্য। শায়খ আল জাওলানী সহ মোট ছয়জন ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে জাবহাত আল-নুসরা। বাগদাদীর পক্ষ থেকে জাবহাত আল নুসরার জন্য সাহায্য ছিল প্রথম দিকের আর্থিক সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অল্প দিনের মধ্যেই আসাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর, দুঃসাহসী এবং সামরিক ভাবে দক্ষ বাহিনী হিসেবে জাবহাত আল নুসরা পরিচিত হয়ে ওঠে। ২০১৩ সালে আবু বাকর আল বাগদাদী দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাককে দাওয়ালাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাক আশ-শামের রূপান্তরের ঘোষণা দেন। শায়খ জাওলানী এই ঘোষণার বিরোধিতা করেন-এ ধরণের সিদ্ধান্ত শামের জিহাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, এই যুক্তিতে। তিনি বলেন, যেহেতু তার এবং বাগদাদী দুজনেরই আমীর শায়খ আইমান, তাই তিনি এই সিদ্ধান্তের ভার তার উপর অর্পণ করছেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন সেটাই শায়খ জাওলানী মেনে নেবেন। এর আগ পর্যন্ত জাবহাত আল নুসরাহর আল-ক্বাইদার সাথে সম্পৃক্ততার কথা গোপন রাখা হয়েছিল। বাগদাদীও শায়খ আইমানের কাছে একটি চিঠি লেখে, এবং শায়খ জাওলানীর ব্যাপারে অভিযোগ করে বিচারের দায়িত্ব শায়খ আইমানের উপর ন্যস্ত করে। পরবর্তীতে শায়খ আইমান শায়খ জাওলানীর পক্ষে রায় দেন, নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত না যাওয়ায় বাগদাদী তার আমীরের অবাধ্য হয় এবং বাইয়াহ ভঙ্গ করে।

জাবহাত আল নুসরা শুরু থেকে "জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা" মেনে চলার চেষ্টা করে। এর ফলে তারা সিরিয়ান জনগণের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে। শামের সাধারণ জনগণ জাবহাত আল নুসরাকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। সমগ্র বিশ্ব থেকে জাবহাত আল নুসরার

সাথে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও, প্রকৃত ভাবে ইসলামের জন্য লড়াই করছে এমন কোন জামা'আ আল-নুসরার সাথে সম্পর্কচ্ছেদে রাজি হয় নি। আল-নুসরা গভীরভাবে শামের জনগণ এবং শামের জিহাদের মধ্যে নিজেদের প্রোথিত করতে সক্ষম হয়েছে। যেকারনে বাশার-ইরান-হিযবুল্লাত-রাশিয়া-অ্যামেরিকা সব পক্ষই মূল হুমকি মনে করে জাবহাতকে। এর প্রমাণ হল, অনেক ক্ষেত্রেই বাশারের সেনাদল এবং জামাতুল বাগদাদীর সেনারা পাশপাশি অবস্থান করেছে (যেমন হাসাকাহ) কিন্তু একে অপরকে আক্রমণ করে নি। অনেক ক্ষেত্রেই দুই দিক থেকে বাশার/হিযবুল্লাত এবং জামাতুল বাগদাদী জাবহাত আল নুসরাকে আক্রমণ করেছে (যেমন ক্বালামুন, এবং দেইর আয যুর)। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে রাশিয়ান জেট জাবহাতের উপর বোমা ফেলছে আর দুই দিক থেকে বাশার-বাগদাদীর সেনা আক্রমণ করছে (যেমন আলেপ্পো।)। কেন রাশিয়া-ইরান-হিযবুল্লাত-বাশার-অ্যামেরিকা জাবহাতকে মূল হুমকি মনে করে কিন্তু মিডিয়াতে ক্রমাগত জামাতুল বাগদাদীর বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা বলে? এর পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে।

- জামাতুল বাগদাদীর কোন আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু শামে যদি কোন সমঝোতায় আসতে হয় তাহলে আল-নুসরাকে বাইরে রাখা যাবে না। তাই যদি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যায় তাহলে কাফির ও রাফিদ্বাদের মনমতো এক সমঝোতা করা সম্ভব, যা আল-নুসরা টিকে থাকলে সম্ভব না।

- যারা বাশারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, জামাতুল বাগদাদী তাদেরকে আক্রমণ করছে এবং হত্যা করছে। সুতরাং এক্ষেত্রে জামাতুল বাগদাদী বাশারের কাজকে সহজ করে দিচ্ছে। বাশার বিরোধী জিহাদকে বিভক্ত করছে। জামাতুল বাগদাদীর কারণে আগে যে দলগুলো তাদের সবগুলো বন্দুকের নল বাশারের দিকে ঘুড়িয়ে রেখেছিল তারা এখন অর্ধেক নল নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যই বাগদাদীর দিকে ঘুরাতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া এমন সব উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ নেতাকে বাগদাদীর সেনারা খুঁজে খুঁজে হত্যা করছে, যাদের নাগাল বাশারের সেনারা পাচ্ছিলো না। বাগদাদীর টিকে থাকার অর্থ বাশারের বিরোধীদের শক্তিক্ষয় হওয়া।

- অন্যদিকে বাগদাদীর দলের পক্ষে বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক, এমনকি সিরিয়ার জনগণের, এবং বাগদাদীর নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলের মুসলিমদেরই কোন সমর্থন নেই। তাই একবার সব বাশারবিরোধী দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে, বাগদাদীর দলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে তাদের মুছে ফেলা কঠিন কিছু না। কিন্তু জাবহাত সিরিয়ার সব দলকে বাশারের বিরুদ্ধে একত্রিত করতে চায়। তাদের আছে ব্যাপক জনসমর্থন এবং আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিমদের সমর্থন। একারণে তাদের সরানো অধিক লাভজনক।

- সিরিয়াতে জামাতুল বাগদাদীর চেইন অফ কমান্ড হল মূলত ইরাকিদের দ্বারা গঠিত। যাদের সিরিয়ার জনগণ এবং সমাজের সাথে গভীর সম্পর্ক নেই। একারণে তাদের সিরিয়া থেকে উপরে ফেলা সহজ।

- জামাতুল বাগদাদীর ক্ষমতা প্রপাগ্যান্ডা নির্ভর, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা। তাদের অধীনে থাকা অধিকাংশ অঞ্চল হল জনবিরল মরুভূমি। আর জাবহাতের কৌশল হল তাদের ভূমিকা এবং ক্ষমতা ছোট করে দেখানো। তারা এমন সব জায়গা নিয়ন্ত্রন করে যেগুলো কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ইদলিব।

- জামাতুল বাগদাদী একসাথে সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বসে আছে। কিন্তু আল-নুসরা কৌশলগত কারণে একটি, একটি করে শত্রু নিধনের নীতি গ্রহণ করেছে। আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। যেমন জামাল মারুফের সেক্যুলার SRF এর বিরুদ্ধে জামাতুল বাগদাদী অনেক হাকডাক করেছে কিন্তু তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। আর নুসরা তাদের ব্যাপারে চুপ থেকেছে, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্রই, SRF কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এবং এ কাজের পর জনগণের সমর্থনও পেয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে হারকাত হাযমের ব্যাপারেও। একারণে শামে পশ্চিমা পরিকলনা বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি আল-নুসরা।

- জামাতুল বাগদাদী দমনের কথা বলে সিরিয়া আক্রমণ করার পলিসি পশ্চিমাদের গেলানো যতটা সহজ, জাবহাত আল নুসরাকে আক্রমণ করার কথা বলে তা করা অতোটা সহজ না।

জাবহাত আল-নুসরার সবচেয়ে বড় সফলতা হল নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে সিরিয়ার সমাজ এবং শামের জিহাদের মধ্যে প্রোথিত করতে সক্ষম হওয়া। আর এটা সম্ভব হয়েছে মূলত এই সাধারণ দিকনির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে। ২০১৪ সালে একটি লিকড অডিও বার্তায় শামে একটি সম্ভাব্য ইমারাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শায়খ জাওলানীর মুখ থেকে শোনা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে জাবহাত আল নুসরার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, এই মুহূর্তে কোন ইমারাহ ঘোষণার পরিকল্পনা তাদের নেই।

গেরিলা যুদ্ধের দুটি পদ্ধতিঃ

AQAP, জাবহাত আল নুসরা এবং জামাতুল বাগদাদীর কৌশলের দিকে তাকালে গেরিলা যুদ্ধের দুটি মডেলের উদাহরণ দেখা যায়। প্রথমটি হল, জনসমর্থন কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধে সামরিক শক্তির চেয়ে রাজনৈতিক শক্তিকে, জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের প্রোথিত করাকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। একে মাওইস্ট গেরিলা ডকট্রিনও বলা হয়। আধুনিক কালে যতগুলো গেরিলা

যুদ্ধ সফল হয়েছে, মাও সে তুং কৃষক বাহিনী থেকে শুরু করে, ভিয়েতনামের ভিয়েতকং, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ, অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ – এই সব গুলোতেই মাওইস্ট গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুসৃত হয়েছে। এ ধরণের যুদ্ধের একটি মূলনীতি হল জনগণের সাথে গেরিলা যোদ্ধার গভীর সম্পৃক্ততা। একে মাও সে তুং বর্ণনা করেছিল এভাবে – জনগণ হল পানি যার মধ্যে গেরিলারূপী মাছ সাঁতরে বেড়ায়। একই কথা শায়খ উসামা এবং শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিব্বির কথায় বারবার ফুটে উঠেছে। জনসমর্থন ব্যতীত মুজাহিদিনের অবস্থা হবে পানি ছাড়া মাছের মতো, যার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব না। এজন্য সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি জনসমর্থন তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে তা সামরিক সক্ষমতার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তি (অর্থাৎ মুজাহিদিনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি জনসমর্থন) ছাড়া গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং অপারেশান চালানোর মতো সক্ষমতা অর্জন দুঃসাধ্য। সহজ ভাষায় মুজাহিদিনের কার্যক্রম সুচারু ভাবে চালানোর জন্য একটি নিরাপদ ঘাঁটি দরকার, যেখানে থেকে গিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তারা পুনরায় সেখানে ফিরে এসে সংগঠিত হতে পারবেন। চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধের পর্যায়ে প্রবেশ করার আগে, এরকম সমর্থন তৈরির মাধ্যমে শক্তি, সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। যারা শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের দাওয়াহ-ইদাদ-রিবাত-ক্বিতালের পর্যায়ক্রমিক মডেলের ব্যাপারে পড়েছেন, তাদের কাছে মাওইস্ট গেরিলা ডক্ট্রিনের সাথে শায়খ আব্দুলাহ আযযামের মডেলের সাদৃশ্য পরিষ্কার ফুটে উঠবে। এ মডেল অনুযায়ী সামরিক কার্যক্রম শুরুর আগে, "জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং সংগঠিত করা", তারপর "আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক বা আদর্শিক ঐক্য গঠন" অপরিহার্য। এপর্যায়ের পর আসবে ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি ও প্রসারের একটি পর্যায়, এবং তারপর আসবে চূড়ান্ত পর্যায়, যা হল চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ এবং শত্রুর ধ্বংস।

অর্থাৎ মাওইস্ট মডেলের ধাপগুলো হচ্ছেঃ

১। জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং সংগঠিত করা

২। আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক বা আদর্শিক ঐক্য গঠন

৩। ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ এবং শত্রুর ধ্বংস

আর শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম যে ধাপগুলোর কথা বলেছেনঃ

১। দাওয়াহ

২। ইদাদ(প্রস্তুতি)

৩। রিবাত (সীমান্ত প্রতিরক্ষা)

৪। ক্বিতাল

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আমরা এক কাফিরের তৈরি মডেল অনুসরণ করবো? এক্ষেত্রে উত্তর হবে, আমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে কাফিরের কাছ থেকে গ্রহণ করছি না, গ্রহণ করছি রণকৌশলের ক্ষেত্রে। খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটা করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়, যখন তিনি ﷺ, সালমান আল ফারেসি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে খন্দক খনন করেছিলেন, যা ছিল পারস্যবাসীর একটি রণকৌশল। এছাড়া আমরা যদি হিজরতের পরের সারিয়্যার দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যায়, গাযয়াতুল বদরের আগে ও পরের অধিকাংশ সারিয়্যাই ছিল আক্রমণ ও পশ্চাৎপসরনের, যাকে আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের ভাষায় "হিট অ্যান্ড রান" [Hit & Run] আক্রমণ বলা হয়। আরেকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি ছিল আল-ইঘতিয়াল বা গুপ্তহত্যার – যার সফল ব্যবহার, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি। এছাড়া আমরা দেখি আবু বাসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলার বিরুদ্ধে যে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন তার জন্য তিনি একটি নিরাপদ ঘাঁটি/সেফ যোন এবং "হিট অ্যান্ড রান" পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

আল-ক্বাইদা কর্তৃক এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়, আরব বসন্তের পরবর্তী অরাজকতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। আরব বসন্তের সময় যে অরাজকতা সৃষ্টি হয় তার সুযোগে আল-ক্বাইদা এমন সব জায়গায় তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করে যেসব অঞ্চলে পূর্বে তাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল না। যেমন তিউনিসিয়া, মিশর এবং লিবিয়া। এখানে উল্লেখ্য এসব অঞ্চল থেকে বেশ কিছু দল জামাতুল বাগদাদীকে বাই'য়াহ দিয়েছে এটা সত্যি, তবে জামাতুল বাগদাদী এই দলগুলোর কোনটিই গড়ে তোলেনি। বরং এ দলগুলোর সবগুলোই ছিল আল-ক্বাইদার সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত। পরবর্তীতে জামাতুল বাগদাদীর সাফল্য দেখে এবং সামরিক ও আর্থিক সহায়তার আশ্বাসের কারণে কিছু দল তাদেরকে বাই'য়াহ দেয়। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে খোদ ইরাক থেকে শুরু করে যে জায়গাতেই জামাতুল বাগদাদীর সম্প্রসারণ ঘটেছে কোন একটি জায়গাতে তারা জিহাদের ফিল্ড তৈরি করে নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল-ক্বাইদা ফিল্ড তৈরি করেছে, আর তার পর জামাতুল বাগদাদী সেটার সুযোগ নিয়েছে।

এছাড়া আল-ক্বাইদার ব্যবহৃত আরেকটি কৌশল হল গোপনে নিজেদের প্রসার ঘটানো, বৃদ্ধি, বিভিন্ন দলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা গোপন করা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মিডিয়াতে প্রচারে না যাওয়া। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদীর আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল-ক্বাইদা চায় সবাইকে বোঝাতে যে, তারা কোথাও নেই। জামাতুল বগাদাদী চায় সবাইকে বোঝাতে যে, তারা সব জায়গায় আছে। বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ততা গোপন করার ব্যাপারে শায়খ উসামার যুক্তি ছিল- যখনই আল-ক্বাইদার সাথে কোন দলের সম্পৃক্ততার প্রকাশ পায় তখনই তাদের বিরুদ্ধে কুফফারের আক্রমণ বেড়ে যায়। এ কারণে এটা গোপন রাখাই উত্তম।

গেরিলা যুদ্ধের অন্য পদ্ধতিটিকে বলা হয় ফোকোইস্ট ডক্ট্রিন। এ পদ্ধতির প্রবক্তা হল চে গুয়েভারা। এ পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া সফল গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে জনসমর্থন প্রয়োজন তা সহিংসতার মাধ্যমেই তৈরি করা সম্ভব। গুয়েভারা মাও সে তুং-এর মডেলকে মূলত উলটে দেয় এবং এই মত প্রচার করে, যখন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ করা হবে, সহিংসতা চালানো হবে তখন আপনাআপনি মানুষের মধ্যে বিপ্লব-বিদ্রোহ-জাগরন সৃষ্টি হবে। জামাতুল বাগদাদী এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছে। তারা সমর্থন সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে সহিংসতার ব্যবহারে বিশ্বাসী, যা তাদের হলিউড ধাঁচের হরর ফিল্ম ধরণের ভিডিও গুলো থেকে প্রতিভাত হয়। মজার ব্যাপার হল, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উজ্জীবিত ইরাকি বা'থ পার্টিও এই ফোকোইস্ট মডেলে বিশ্বাসী ছিল। জামাতুল বাগদাদীর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী সাফল্যকে গুরুত্ব দেয়, যদি এই স্বল্পমেয়াদী সাফল্যকে মিডিয়া প্রপাগ্যান্ডার কাজে লাগানো যায়। ফোকোইস্ট ধারার একমাত্র সফল প্রয়োগ হয়েছে কিউবাতে। এছাড়া কঙ্গো, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা এবং কলম্বিয়া সব জায়গাতেই এ ধারা ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র কলম্বিয়াতে ফার্ক এখনো টিকে আছে, তবে তারা আদর্শিক গেরিলা বাহিনীর বদলে, বর্তমানে একটি কোকেন ব্যাবসায়ী মিলিশিয়াতে পরিণত হয়েছে।

একথা ধরে নেয়া ভুল হবে যে আল-ক্বাইদা বা জামাতুল বাগদাদী পুরোপুরি মাওইস্ট বা ফোকোইস্ট গেরিলা যুদ্ধের মডেল অনুসরণ করে। বরং এটা বলাই অধিক সঠিক যে দুটি দলই এ দুটো মডেলের মিশেলে একটি হাইব্রিড মডেল ব্যবহার করে। তবে আল-ক্বাইদার মডেল মাওইস্ট মডেলের অধিক নিকটবর্তী, বিশেষত জনসমর্থন কেন্দ্রিক দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুসরণের মাধ্যমে। আর জামাতুল বাগদাদীর মডেল ফোকোইস্ট মডেলের অধিক নিকটবর্তী।

মুসলিম বিশ্বে গেরিলা যুদ্ধে সর্বাধিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে আফগানিস্তানে। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বের সেনাবাহিনীর তুমুল আক্রমণের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধ করে তালিবান টিকে আছে এবং বিজয় অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই বিজয়ের পেছনে আফগান জনগণের গভীর ও ব্যাপক সমর্থনের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদীর গৃহীত মডেলের মাধ্যমে তারা সাময়িক সাফল্য পেয়েছে এটা সত্য, কিন্তু সার্বিক ভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিজেদের সাথে এবং নিজেদের আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। খোদ ইরাকের গোত্রগুলোই সামরিক সক্ষমতা শেষ হবার সাথে সাথে জামাতুল বাগদাদীকে ত্যাগ করবে- এটা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে। কারণ তাদের উপর জামাতুল বাগদাদীর নিয়ন্ত্রন সম্পূর্ণভাবে শক্তির মাধ্যমে অর্জিত। কিন্তু এই পদ্ধতি না দীর্ঘমেয়াদে ফলপ্রসূ, আর নাইবা এটা নাবুওয়্যাতের মানহাজ। ইরাক এবং সিরিয়াতে কৌশলগত ভাবে জামাতুল বাগদাদীর সবচেয়ে প্রশংসনীয় দুটি পদক্ষেপ হল তেলক্ষেত্রসমূহ দখলে নেয়া এবং ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে যোগযোগের রুট নিজেদের নিয়ন্ত্রনে

নিয়ে নেয়া। প্রথমটির কারণে তারা অর্থের একটি স্থায়ী উৎস পেয়েছে। আর দ্বিতীয়টির কারণে তারা ইরাক থেকে সিরিয়াতে খুব দ্রুত সেনাদের আনা-নেয়া করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যখনই এদুটির নিয়ন্ত্রন তারা হারিয়ে ফেলবে, তৎক্ষণাৎ তারা একটি ইমারাহর বদলে "হিট অ্যান্ড রান" পদ্ধতির একটি আন্ডারগ্রাউন্ড তানজীমের পর্যায়ে ফিরে যাবে। যখন সেটা ঘটবে তখন ইরাকী গোত্রগুলো এবং সিরিয়ার গোত্রগুলো তাদের সমর্থন দেবে না। বরং তারা তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। জামাতুল বাগদাদীর তখন আক্ষরিক অর্থেই ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো অবস্থা হবে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তালিবান গেরিলারা যখন শহরগুলো থেকে পশ্চাৎপসরন করছে তখন তারা জনগণের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সাধারণ মুসলিমদের মাঝে মিশে গেছে, জনগণ তাদের আশ্রয় দিয়েছে, সহায়তা দিয়েছে এবং রক্ষা করেছে। তারপর তারা পুনরায় সংগঠিত হয়ে, আক্রমণ করেছে- এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় অর্জন করেছে।

ইমারাহঃ

লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, আল-ক্বাইদার প্রতিটি শাখাই কোন না কোন সময় ইমারাহ ঘোষণার মতো তামক্বীন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। AQAP, জাবহাত আল নুসরার ব্যাপারে, আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এছাড়া AQIM এবং আল-শাবাব বিভিন্ন সময়ে ইমারাহ ঘোষণার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আল-শাবাবের পক্ষ থেকে ইমারাহ ঘোষণার ব্যাপারে তানজীম আল-ক্বাইদার অনুমতিও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুমোদন দেয়া হয় নি। তানজীমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে অঞ্চলের উপর তামক্বীন অর্জিত হয়েছে সেখানে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে ইমারাহ ঘোষণা না করার। এর কারণ হল, যখন আল-ক্বাইদার পক্ষ থেকে ইমারাহ ঘোষণা করা হবে, তখন সাধারণ মুসলিম জনগণ এ ইমারাহকে নিজেদের ইমারাহ মনে না করে, আল-ক্বাইদার ইমারাহ মনে করবে। ইয়েমেন, সোমালিয়া, মাগরিবের মতো গোত্রীয় সমাজে এর ফলে অসন্তোষ, চাপা কিংবা প্রকাশ্য, সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। শামের ক্ষেত্রে যদি আল-নুসরা নিজেরাই ইমারাহ ঘোষণা করতো তাহলে অন্যান্য দলগুলো নুসরাকে নিজের প্রতিপক্ষে মনে করা শুরু করতো। এর ফলে বাশারের বিরুদ্ধে জিহাদ ক্ষতিগ্রস্থ হতো। এছাড়া আরেকটি সমস্যা হল, আনুষ্ঠানিক ভাবে ইমারাহর ঘোষণা হলে সেটা অ্যামেরিকার হামলা এবং আন্তর্জাতিকভাবে অ্যামেরিকার আগ্রাসনের পক্ষে একটি অজুহাত হিসেবে কাজ করতো। তৃতীয় কারণ, এবং অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ কারণ হল, প্রতিটি অঞ্চলে, প্রতিটি দল গেরিলা যুদ্ধের পর্যায়ে আছে। তারা কখনো তামক্বীন অর্জন করছে, আবার কৌশলগত কারণে পিছু হটছে। এ অবস্থায় যেহেতু ইমারাহর ঘোষণা দেয়া অনুচিত যেহেতু ঘোষণা না দিয়েও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে। কারণ আগে আমরা যেমনটা বলেছি, ইমারাহ

কিংবা খিলাফাহ শুধুমাত্র একটি ঘোষণা না বরং বাস্তবতাও। একই সাথে নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ের স্থিতিশীলতা অর্জনের পূর্বে ইমারাহর ঘোষণা দেয়া উচিৎ না। কারণ ঘোষণার কিছুদিন পর, সেই ইমারাহর নাম-গন্ধ না থাকা, এরকম ঘটনা মুজাহিদিন ও জিহাদ সম্পর্কে উম্মাহর সাধারণ মুসলিমদের ধারনাকে নষ্ট করে।

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল এই পর্বে, লেখা বড় হয়ে যাবার কারণে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। আল্লাহ্ চাইলে পরবর্তী পর্বে, এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ্।